পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্ক কি কলোনিয়াল?

মোহাম্মদ আজম*

১

১৮৯১ সালে *হিতবাদী* পত্রিকায় টানা-প্রকাশিত ছয়টি গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের 'প্রকৃত' সূচনা হয়েছে বলে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক-সমালোচক মহলে মতৈক্য আছে। 'পোস্টমাস্টার' ওই ছয় গল্পের একটি (প্রভাতকুমার, ১৪২৫ : ৩৭)। গল্প-বলার কার্যকর কলাকৌশল আবিষ্কার, প্রকৃতিকে বিষয় ও কলার অঙ্গীভূত করে-নেয়ার সামর্থ্য, এবং আবেগ ও অনুভূতির সুগভীর ব্যঞ্জনা – প্রধানত এ তিন দিক থেকে সমালোচক-ভাষ্যকারগণ গল্পটি নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। আগের এসব পাঠ ও বিশ্লেষণকে আমরা তিনটি কাজ-চলতি ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. বিপুল-অধিকাংশ সমালোচক গল্পটি পড়েছেন অনুভূতির গভীরতা ও বিস্তৃতির দিক থেকে।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪১০ : ৩৫০) 'গীতধর্মী' গল্প হিসেবেই 'পোস্টমাস্টার'কে দেখেছেন। লিখেছেন, 'একটি স্বজনহারা নিঃসহায় গ্রাম-বালিকার স্নেহ লোলুপ হৃদয় আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কি সকরুণ অশ্রুসজল ছায়াপাত করিয়াছে এই গল্পটির উপর!' ফিরে যাওয়ার কালে নৌকায় পোস্টমাস্টারের মনোভাব উদ্ধৃত করে তিনি আরো লিখেছেন, 'এমনই করিয়া পোস্টমাস্টার ও রতনের দুঃখ একটা উদাস-সকরুণ পরিসমাপ্তি লাভ করিল, এবং সেই অব্যক্ত মর্মব্যথা যেন সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অপূর্ব সুরের জগৎ সৃষ্টি করিল।'

বুদ্ধদেব বসুর (১৯৮৩ : ৪০) সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধি প্রায় একই রকম :

> 'পোস্টমাস্টারে'ও... ব্যক্তিগত শোক বিশ্বশোকে রূপান্তরিত হয়েছে; এই গল্পটি তার অত্যল্প আয়তনের ভিতর দিয়ে মানবহৃদয়ের একটি গভীর অথচ সহজ বেদনাকে এমনভাবে আমাদের প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয় যে মনে হয় যেন একটি গ্রাম্যবালিকার ক্ষণিক অশ্রুজলে সারা বিশ্ব ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

---

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তপোব্রত ঘোষ (২০১২ : ৫৯) গল্পের শেষলগ্নে লেখকের আবির্ভাবকে আক্ষরিক মূল্য দিতে আগ্রহী। তাঁর মতে, এখানে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের সাথে রতনের উপলব্ধির একটা সাম্য তৈরি হয়েছে। তিনি *মানসী*সহ রোমান্টিক প্রবণতার অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, সমধর্মী ভাব রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রকাশ করেছেন। এ কারণেই 'রতনের সঙ্গে নিগূঢ় সমবেদনার উপলব্ধিতেই গল্পকারের এই স্বগতোক্তিটুকু 'পোস্টমাস্টার' গল্পের সবচেয়ে রহস্যময় সম্পদ।' আর 'গল্পের চরিত্রের সঙ্গে গল্পকারের বিশিষ্ট এই একাত্মতার ফলে গল্পবস্তুকে অতিক্রম করে ছোটগল্পের এই অন্তর্মুখী আত্মবিস্তারই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শিল্পকৃতির মূল কথা।'

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯৭ : ২৪) লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের যেসব গল্প আকস্মিকতা ও চমক ছাড়াই শেষ হয়েছে, তার তালিকায় 'পোস্টমাস্টার'ও আছে। তাঁর মতে, এর সমাপ্তি সরল ও মর্মস্পর্শী। 'পাঠকমনে সেই চিত্তস্পর্শী আবেদনের সৃষ্টি হয়েছে কেবল অসহায় নিঃসঙ্গ রতনের দুঃসহ হতাশার বোধে নয়,... দাদাবাবুর জন্য তার পথ চেয়ে থাকার অন্তহীনতার ব্যঞ্জনায়।' ফলে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও স্বভাবতই অনুভূতির গভীরতা ও বিস্তারের দিকেই যায় (১৯৯৭ : ৮৩)।

> পোস্টমাস্টার গল্পের নগণ্য পোস্টমাস্টার ও এক গ্রাম্য বালিকার আপাত-তুচ্ছ কাহিনী গল্পের শেষে বহমান জীবনস্রোত ও তার চারপাশের পরিবেশের সংস্পর্শে যেন এক দূরব্যাপ্ত মহিমাময় জীবনচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (১৩৭২ : ৭৯) কথায়ও দেখি সে একই সুরের অনুরণন :

> 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি গোপন অনুভূতি বিশ্বকেন্দ্রিক সর্বজনীন অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি ক্ষুদ্র আখ্যানের মধ্যে কবির কল্পনা নিকটকে দূরের সঙ্গে, এককে বহুর সঙ্গে বন্ধন করেছে এবং সামান্যকে অসামান্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। কবি-কথাকারের এটি একটি অপূর্ব রচনা।

এ ধারার অনেক সমালোচক গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন বিমূর্ত ব্যঞ্জনা, অথচ শেষের অনুচ্ছেদে দর্শনাশ্রয়ী বক্তব্য হাজির হয়েছে সরাসরি – এ অসামঞ্জস্য খোদ অনুচ্ছেদটি নিয়েই তাঁদের সংশয়ে ফেলে দিয়েছে।

নীহাররঞ্জন রায়ের (১৪১০ : ৩৫০) মনে হয়েছে, 'কলাকৌশলের দিক হইতে এই তত্ত্বের উদয় না হইলেই ভালো হইত'। বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৩ : ৪১) আপত্তিটা তুলেছেন আরো সরাসরি :

> এ বেদনা যে 'ভ্রান্তি', এবং 'বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়' যে একেবারে মোহভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও 'দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে', এই তত্ত্বকথা শোনবার জন্য আমাদের মন ঠিক প্রস্তুত থাকে না; এ তত্ত্বটুকু গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো, প্রচ্ছন্ন থাকলেই ভালো হ'তো।

'পোস্টমাস্টার' গল্প-পাঠে এ মত-যে খুব জোরালো ছিল, তার প্রমাণ মিলবে আরেকটি তথ্য থেকে। দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের করা 'পোস্টমাস্টার' গল্পের যে-ইংরেজি অনুবাদটি সংশোধন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *মাসি এন্ড আদার স্টোরিজ* বইয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে Alas for the foolish human heart!-এ পৌঁছিয়েই গল্প শেষ হয়ে গিয়েছে (তপোব্রত, ২০১২: ৫৮)। বলা যায়, খোদ লেখক তাঁর রচনাকালীন 'অচেতন' আর পরবর্তীকালীন 'সচেতনে'র মধ্যে বিরোধ দেখতে পেয়েছিলেন।

দুই. কেউ কেউ গল্পটি পড়েছেন প্রেমের গল্প হিসেবে।

এ মতানুসারী সৈয়দ শামসুল হকের (২০০৫ : ১৩৩) শেষ মন্তব্যটি এরকম: ''পোস্টমাস্টার', মাত্র দু'হাজার শব্দে, মাত্রই দুটি চরিত্র নিয়ে রচিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটি প্রেমের গল্পই শুধু নয়,... জটিলতম একটি গল্প – অনুভবের দিক থেকে এবং নির্মাণের দিক থেকে।' তাঁর মতে (২০০৫ : ১২৮), শেষাংশই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বীজকথা। এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে তাঁকে দেখাতে হয়েছে, প্রেমের দিকটা সক্রিয় ছিল কেবল রতনের দিক থেকে। শুধু তাই নয়, 'আমাদের পোস্টমাস্টার' কথাটিকে পুঁজি করে তিনি এ গল্পের কথক হিসেবে আমদানি করেছেন অন্য কোনো ব্যক্তিকে, যে হয়ত উলাপুর গ্রামেরই বাসিন্দা, আর মানব-জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে গভীরভাবে ওয়াকিবহাল। এ ব্যক্তিই, তাঁর ভাষ্যমতে, রতন-পোস্টমাস্টার শুধু নয়, অন্য অনেক অভিজ্ঞতার বরাতে শেষ অনুচ্ছেদের কথাগুলো উচ্চারণ করতে পেরেছে।

অন্য অনেকের পর্যালোচনায় প্রেম-সম্পর্কের আভাস থাকলেও তা সরাসরি উত্থাপিত হয়নি।

তিন. কলোনিয়াল বাস্তবতার দিক থেকে 'পোস্টমাস্টার' গল্প পড়েছেন কেউ কেউ।

মাসুদুজ্জামান (২০১৩ : ২৫২-৫৩) পোস্টমাস্টারকে দেখেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকাশ হিসেবে, রতনকে দেখেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বিচ্ছিন্ন সাধারণ মানুষ ও গ্রামবাসী হিসেবে, আর তাদের মিলতে না-পারাকেও ব্যাখ্যা করেছেন একই প্রক্রিয়ার বরাতে। পোস্টাফিস ঘরের বর্ণনায় তিনি দেখেছেন ঔপনিবেশিক শোষণ। এমনকি পোস্টমাস্টারের অতি সামান্য বেতনকেও তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রশান্ত মৃধা (২০১৭) এ গল্পে বারবার চিহ্নিত প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং গল্প-পাঠে কলোনিয়াল বাস্তবতাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় এনেছেন। তবে তিনি আসলে ব্যাপারটা দেখেছেন 'বাস্তবে'র মধ্যে – নীলকুঠির উল্লেখ, কলোনিয়াল নগরী কলকাতার প্রসঙ্গ, পোস্টমাস্টার ও তার জনবিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির মধ্যে – গল্পের ভিতরে ফলে-ওঠা 'বাস্তবতা'র মধ্যে নয়।

এ ধরনের পাঠের একটা সংকট হলো, উপনিবেশ-আমলে রচিত প্রায় যে কোনো সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেই কোনো-না-কোনো মাত্রায় এ ধরনের পাঠ সম্ভব। উপনিবেশের আগের ও পরের বহু রচনায়ও সমধর্মী বর্ণনা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, গরিবি বা জন-বিচ্ছিন্নতাকে যদি উপনিবেশের কুফল হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে রেল বা প্রাসাদ বা ঐশ্বর্যের নানা চিহ্নকে কি বলব ঔপনিবেশিক আশীর্বাদ? বস্তুত, এঁরা গল্পের ভাবগত দিককে একেবারেই আমলে আনেননি। যেমন সরাসরি কোনো কলোনিয়াল-সম্পর্ক আবিষ্কার করতে গেলে-যে পোস্টমাস্টারের চরিত্রায়ণ তাতে একেবারেই খাপ খায় না, সে প্রসঙ্গ তাঁদের বিবেচনার বাইরে থেকে গেছে।

উপরে 'পোস্টমাস্টার' গল্প-পাঠের যে-তিনটি ধরন চিহ্নিত করা হলো, তার সব কটিতেই 'সম্পর্ক' সাধারণ উপাদান। বস্তুত নির্মিত 'সম্পর্কে'র অস্পষ্টতাই পাঠ-ভিন্নতার মূল। আমাদের প্রস্তাব, নির্মিতি ও তাৎপর্যের দিক থেকে পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্ক কলোনিয়াল। কলোনিয়াল সম্পর্কের এটা খুব বিশিষ্ট এক ধরন, যা বিশেষভাবে উনিশ শতকের কলকাতার জন্য প্রযোজ্য। এভাবে দেখলে গল্পের ধারাবিবরণী ও অভ্যন্তর-কলার সাথেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সেক্ষেত্রে এ পাঠের জন্য অন্য পাঠগুলোকে সম্পূর্ণ খারিজ করার দরকার হয় না। এগুলো একই সাথে সহাবস্থান করতে পারে। আমরা আরো দেখাব, রবীন্দ্রগল্পের বাস্তবতা ও উপলব্ধির খুব বিশিষ্ট ধরন, বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অবলম্বিত বিশেষ শিল্পকৌশল, প্রকৃতি-নির্ভরতা ও ব্যবহার, মানুষ ও জীবন-জগৎ সম্পর্কে বিশেষ উপলব্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়েই কেবল এ রূপকধর্মী পাঠ সম্ভব।

২

'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সম্পর্কের বয়ান শুরু হয়েছে পঞ্চম অনুচ্ছেদ থেকে। চলেছে শেষ পর্যন্ত। তবে বিদায়বেলায় দুজনের সংলাপ ও মনোভাবে প্রকাশিত ভাবকে বলতে পারি পূর্বতন সম্পর্কের উন্মোচন। সেদিক থেকে সম্পর্কের নির্মিতি চলেছে অন্তত তিন ধাপে। প্রথমটিকে বলতে পারি সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা তৈরির পর্ব। অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে কথাবার্তার বিশেষ ঢঙের মধ্য দিয়ে। মনিব ও ভৃত্য হিসেবে দৈনন্দিন কথাবার্তার বাইরে সম্পর্কের সে এক অন্য আয়োজন। পোস্টমাস্টারই রতনকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' এ প্রশ্ন ঠিক তথ্যজ্ঞাপক নয়। তারচেয়ে বেশি কিছু। আর এ সূত্রে দিনের পর দিন তাদের যেসব কথাবার্তা হয়, তাতেও সংসারের দৈনন্দিন কাজের কথা ছাড়িয়ে অনুভূতির অংশটাই বড় হয়ে ওঠে।

সম্পর্কের দ্বিতীয় ধাপে দেখি, পোস্টমাস্টার রতনকে অক্ষরজ্ঞান দিচ্ছে। মনিবের দিক থেকে প্রাথমিকভাবে পর্বটি সময়-কাটানোর কলা হিসাবে শুরু হলেও রতনের দিক

থেকে ছিল প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিকতা। অন্যদিকে শিক্ষা-গ্রহণে নিঃশর্ত আগ্রহের সাথে সাথে দাদাবাবুর নৈকট্যে আসার একটা মওকা হিসেবেও রতন পর্বটিকে কাজে লাগায়। সেখানে নিজের সামর্থ্য প্রমাণের কসরত চোখে পড়ে।

পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়লে সম্পর্কের তৃতীয় মাত্রা উন্মোচিত হয় সেবার মধ্য দিয়ে। এ পর্বে রতনের আংশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আগের দু-পর্বে পোস্টমাস্টারের নিশ্ছিদ্র কর্তৃত্বের মধ্যে চলেছে সম্পর্কের মহড়া। উভয় ক্ষেত্রেই রতনের সক্রিয়তা থাকলেও পোস্টমাস্টারই ছিল প্রস্তাবক ও নিয়ন্ত্রক। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যস্থতায় দু-তরফে সাময়িক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আর অন্তত সক্রিয়তার দিক থেকে রতনের সক্ষমতা প্রমাণের সুযোগ আসে। সেবা-গ্রহীতা হিসেবে পোস্টমাস্টার ক্ষমতা-সম্পর্কের সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও সেবা-দাতা হিসেবে রতন নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। আর এর মধ্য দিয়ে সম্পর্কের মাত্রা ও ধরন চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছায়।

এবং এর পরেই বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদের কালেই বস্তুত পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, দুজনের অবস্থা ও অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে একে শুধু সম্পর্ক – তা সে প্রেম হোক বা অন্য কোনো মানবিক-সম্পর্ক – বললে কাজ চলছে না। দুটি চরিত্রের বিশিষ্ট চরিত্রায়ণ ওই সম্পর্ককে ঠিক কোন ধাতে গড়তে চেয়েছে, তার অভ্যন্তর-চলনকে কোন বিধিতে বাঁধতে চেয়েছে, সে খোঁজটাই বড় হয়ে ওঠে।

২.১

ঠিক এখানেই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের সাথে বাস্তবের সম্পর্ক এবং এ গল্পে প্রতিফলিত বাস্তবের অতি-বিশিষ্ট ধরনের পর্যালোচনা জরুরি। অধিকাংশ সমালোচক, বলতে কী, হাতে-গোনা দু-একজন ছাড়া রবীন্দ্র-গল্পের প্রায় সব সমালোচক, গল্পগুচ্ছের বাস্তবতাকে, এবং 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বাস্তবতাকেও, 'সাধারণ' বাস্তব হিসেবেই পড়েছেন। এভাবে পড়ার ফলে দু-ধরনের সংকট তৈরি হয়। প্রথমত, সাহিত্যিক বাস্তবতামাত্রই আর্টিস্টিক বা বানোয়াট। সাহিত্যতত্ত্বের প্রায় সকল বিবরণে শৈল্পিক বাস্তবতার সাথে জাগতিক সাধারণ বাস্তবের সম্পর্ককে 'রিসিপ্রকাল' বা 'পারস্পরিক' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ, এ বাস্তব সাধারণ বাস্তব থেকে তৈরি করে নেয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের বিশেষ বাস্তবতা। এ স্তরান্তর অনুসরণ না করে বাস্তবের অনুকৃতি হিসেবে সাহিত্যপাঠ ফলপ্রসূ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র-গল্পে বাস্তবের রূপান্তরটা অন্তত আরো এক ধাপ বেশি ঘটে। বাস্তবের অনুপুঙ্খ বিবরণ তো দূরের কথা, বাস্তবকে অনুসরণের কোনো দায়ও রবীন্দ্র-গল্প স্বীকার করে না। 'সাহিত্যের স্বরূপ'সহ রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে নিরেট বাস্তবের অনুসরণকে শিল্পকলার কর্মপদ্ধতি ও মর্মের বিপরীত প্রবণতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর গল্পে এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রায়-আক্ষরিক

প্রতিফলন পাওয়া যায়। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পকে 'বাস্তবের গল্প' না বলে গল্পে প্রতিফলিত বাস্তবকে বলা যায় 'গল্পের বাস্তব' (মোহাম্মদ আজম, ২০১৮)।

পোস্টমাস্টার চরিত্রের কথাই ধরা যাক। ইন্দিরা দেবীকে ২৯ জুন, ১৮৯২ তারিখে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়িতে একজন পোস্টমাস্টারের আসার কথা লিখেছিলেন (১৩১৯ : ১২৬)। লিখেছেন, 'তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম।' বাস্তব তথ্যের এরূপ প্রশ্রয় এ গল্পের আলোচকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। কিন্তু সত্য হল, 'পোস্টমাস্টার' গল্পের চরিত্রটির সাথে পূর্ব-বর্ণিত পোস্টমাস্টার তো নয়ই, জগতের কোনো পোস্টমাস্টারেরই বাস্তব সম্পর্ক নেই। বস্তুত, এ চরিত্রটির পোস্টমাস্টার হওয়ারই কোনো প্রয়োজন ছিল না; কারণ, গল্পের বুননে তার পেশাগত কোনো ভূমিকা নেই। কাজকর্ম কম, এমন যে কোনো সরকারি কর্মচারী হলেই চলত। কাজেই গল্পের দিক থেকে পোস্টমাস্টার কোনো প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র নয়। এ কথা আসলে রতনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সত্য। রতন 'গ্রাম্যবালিকা' বটে, কিন্তু গ্রাম্যবালিকার কোনো মর্মগত বিশিষ্টতা চরিত্রটির ক্রিয়া বা ভূমিকা নির্ধারণ করেনি। গ্রামের সাথে তার সম্পর্কের পরিচয়ও গল্পে খুব একটা ব্যবহৃত হয়নি।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৩ : ৩০) 'প্রতিবেশিনী' গল্প সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এখানে নায়িকা বালবিধবা ব'লেই চিহ্নিত, কিন্তু সমস্যাটা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু বেদনাটুকু ধরেছেন। সে বেদনায় সাড়া দিতে পারবে প্রত্যেক যুগের পাঠক।' এ কথা 'পোস্টমাস্টার'সহ রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামবালিকা তো নয়ই, বরং মৃন্ময়ীর সংস্থান করতে গিয়ে গ্রাম-বাংলার পুরুষতান্ত্রিক-নিপীড়ক রূপটাকে হাওয়া করে দিয়ে বেশ একটা নারী-বান্ধব পরিস্থিতি তৈরি করতে হয়েছে। অনেক পরের 'হৈমন্তী' গল্পে স্রেফ পশ্চিমের অনামা কোনো সমাজের বরাত দিয়েই গল্পকার সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে হৈমন্তীকে স্থাপন করার দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। কল্লোলযুগীয় গল্পের সাধারণ প্রবণতার সাথে তুলনা করলেই এ গভীর ফারাক অনুধাবন করা যাবে।

বস্তুত বাস্তবের আলিঙ্গন নয়, বাস্তব সূত্রকে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় বাস্তবতা তৈরিই রবীন্দ্র-গল্পের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। *গল্পগুচ্ছের* গ্রামীণ বাস্তবতাকে কেবল এ সূত্রেই পাঠ করা সম্ভব। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-দর্শনের তথ্য-উপাত্তের সাথে এ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৩ : ১৭): 'শুভযোগ ঘটেছিল তাঁর জীবনে; ঠিক লোকালয়ে ছিলেন না, কিন্তু কাছাকাছি ছিলেন; সংসারে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু মানুষের সংসারযাত্রার দর্শক হয়ে ছিলেন। কল্পনার উৎসাহ ছিল উদার আকাশে, আবার মানবচরিত্র লক্ষ্য করারও সুযোগ ছিলো।' অভিজ্ঞতার এ ধরনই আসলে রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাবলোকের সাথে একীভূত হয়ে তৈরি করেছে *গল্পগুচ্ছের*

কালাতিক্রমী সৌন্দর্য। বলা যায়, বাস্তবের আবহের মধ্যে তাঁর পাত্রপাত্রীরা 'এক দেশকালাতীত ভাবলোকেরও অধিবাসী' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৩ : ৪৬)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-গল্পের গীতিধর্মিতা নিয়ে কৈফিয়ত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং অন্য অনেক সমালোচক। এটা ঘটেছে অন্যদের সমালোচনা ও নিন্দার জবাব দিতে গিয়ে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, গল্পত্ব অক্ষুণ্ন রেখে কাব্যোচিত গীতিধর্ম সংযোজন করতে পারাই রবীন্দ্র-গল্পের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। গল্পগুলোতে এ গভীর নন্দনতাত্ত্বিক ঘটনা কিভাবে ঘটছিল, তার প্রক্রিয়া সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন দেবেশ রায় (২০০৮ : ৬৮) : 'পরিবেশের অতি-বাস্তব থেকে, এক বাস্তবাতিরেক সত্যকে নিষ্কাশিত করে, সেই বাস্তবকেই বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠা দেয়া হচ্ছিল।' আর এর মধ্য দিয়ে বাস্তববাদী নন্দনের বিপরীতে রবীন্দ্র-গল্পে বিশেষ ধরনের রোমান্টিক নান্দনিকতাই কার্যকর হচ্ছিল। রোমান ইয়াকবসনের (১৯৮৭) চিন্তা ধার করে বলা যায়, বাস্তববাদী সাহিত্যের লক্ষণাধর্ম নয়, রোমান্টিক সাহিত্যের রূপকধর্মই রবীন্দ্র-গল্পে আসর জমিয়েছে।

২.২

রবীন্দ্র-গল্পে বাস্তবের এ অতি বিশিষ্ট ও অতুলনীয় পটভূমিতে এবার পোস্টমাস্টার ও রতনের পরিচয় নেয়া যাক।

সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫ : ১৩০) যথার্থই খেয়াল করেছেন, চতুর্থ অনুচ্ছেদ অর্থাৎ 'বিবাহের সম্ভাবনা দেখা যায় না' পর্যন্ত এ গল্পের 'ভিত'। এ অংশেই রচিত হয়েছে গল্পটির পটভূমি। কাহিনিরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এরকম আলাদা পটভূমি রচনা করা জরুরি ছিল; কারণ, চাকরি করতে-আসা এক যুবক আর 'অনাথা' বালিকা রতনকে গ্রামের সাধারণ বাস্তবতার মধ্যে ক্রিয়াশীল করে এ গল্প সম্ভব ছিল না। তাদের একক বা যৌথ সক্রিয়তা গ্রামের সাধারণ বাস্তবের বাইরেই সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই আর-সবকিছু থেকে এবং অন্য সবার থেকে আলাদা করে নিয়ে গল্পের জগৎটি তৈরি করতে হয়েছে। সেখানে লেখকের দিক থেকে বিবরণীর যৌক্তিক পরম্পরা রক্ষার দায় এবং দুজনকে যথাসম্ভব আলাদা করে নেয়ার চেষ্টা বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

প্রথমেই বলা হয়েছে, উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসতে হয়েছে। ক্রিয়াপদের এ গড়ন একজন অনিচ্ছুক ব্যক্তির মনোভাব প্রকাশ করে। কলকাতার ছেলে হিসেবে তার এখানে আসতে না-চাওয়ার কারণ আছে। 'গ্রামটি অতি সামান্য'। 'সামান্য' শব্দটি এখানে তুচ্ছতার কথা বলছে, গ্রাম-বাংলার সাধারণ কোনো পরিচয় দিচ্ছে না। এ গ্রামকে তুচ্ছ বলাটা পোস্টমাস্টারের তাবত কর্মকাণ্ডের বৈধতার জন্য জরুরি। অথচ, সেক্ষেত্রে আবার এ প্রশ্ন উঠবে, এত তুচ্ছ গ্রামে 'পোস্টআপিস' থাকে কিভাবে?

কাজেই যৌক্তিক পরম্পরা রক্ষার খাতিরে লেখককে বলতে হচ্ছে, নীলকুঠির সাহেব নিজ গরজে, হয়ত বাড়তি প্রভাব খাটিয়ে, এরকম পাড়াগাঁয়ে পোস্টাফিস স্থাপন করেছে।

এ কৈফিয়ত পোস্টাফিস-সমস্যার সুরাহা করলেও খোদ পোস্টমাস্টারের জন্য নতুন মুসিবত ডেকে আনে। গল্পের জন্য দরকার ছিল এক অসুখী ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা। অসুখী চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে 'জলের মাছ ডাঙায়' আসার উপমায়, অফিসঘরের 'অন্ধকার' বিশেষণে, আর পানাপুকুর ও জঙ্গলের হাজিরায়। কিন্তু আস্ত একটা নীলকুঠি তার নিঃসঙ্গতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ঝুঁকি কাটানোর জন্য লেখক আরো অন্তত দুই দফা কৈফিয়তের বন্দোবস্ত করেছেন। প্রথমে বলেছেন, কুঠির লোকজনের এমন ফুরসত নেই যে পোস্টমাস্টারের কথা-বলার সঙ্গী হবে; তদুপরি তারা যথেষ্ট ভদ্রলোকও নয়। এ কথা দুটি-যে 'বাস্তবের' যুক্তিতে খুবই দুর্বল, তা আন্দাজ করেই হয়ত লেখক দ্বিতীয় দফা কৈফিয়তের দরকার বোধ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, কলকাতার ছেলেরা মেশামেশিতে কাঁচা। উদ্ধত বা অপ্রতিভ হয়ে তারা মেলামেশার সুযোগ নষ্ট করে। এ গল্পের 'কলকাতার ছেলেটি' কোন পদের, তা অবশ্য খুলে বলা হয়নি। বলা হয়েছে তার কবিত্বের কথা। কবিতায় প্রকৃতি-প্রেম ফুটে ওঠার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু তার পরপরই লেখক আমাদের নিশ্চিত করেছেন, কবিতা পোস্টমাস্টারের মনের প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন নয়। নগরবাসী তরুণটির জন্য এই গ্রাম-বাস এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা।

সৈয়দ শামসুল হকের (২০০৫ : ১২৯) মনে হয়েছে, পোস্টমাস্টারের অবস্থার সাফাই গাইতে গিয়ে লেখক এখানে কলকাতার ছেলেদের প্রতি অবিচার করেছেন। অন্যদিকে, কবিতায় প্রকাশিত মনোভাবের বিপরীতে পোস্টমাস্টারের মনের প্রকৃত অবস্থা বিচার করে আনোয়ার পাশা (২০১৫ : ১৪২) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'পোস্টমাস্টারের এই প্রকৃতি-বিমুখ মনোভাব গল্পের মধ্যে খুবই স্পষ্ট।' শেষোক্ত মন্তব্যটি অবশ্য গল্পের অপরাপর তথ্য-উপাত্তের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু দুজনের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা 'পোস্টমাস্টার' গল্প বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই পাঠ করেছেন। এবং সে কারণেই গল্পের নিজস্ব ভাষা-কাঠামোয় চরিত্রটির অসুখী নিঃসঙ্গতা প্রতিষ্ঠা করতে লেখকের মরিয়া চেষ্টার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি।

গল্পের পটভূমি-অংশের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে রতনকেও পাঠক বিচ্ছিন্ন চরিত্র হিসেবেই আবিষ্কার করে। সে পিতৃমাতৃহীন ও অনাথা। এখানে পেটে-ভাতে কাজ করে। বয়স বারো-তেরো। সেকালের হিসাবে বয়স মোটেই কম নয়। অর্থাৎ বয়সটা 'নারী', 'জননী' বা 'দিদি' রূপে আবির্ভূত হওয়ার উপযোগী। রতন আগে কোথায় কী করত, তার কোনো ইশারা গল্পে নেই। এমনকি তার কোনো পরিচিত বা আত্মীয়

অবশিষ্ট আছে, তেমন লক্ষণও প্রকাশ পায়নি। কাজেই তাকে নিঃসঙ্গ না হোক, একাকী চরিত্র বলা যায়। পোস্টমাস্টার ও রতনের যৌথ একাকিত্ব পোক্ত করতে লেখক আরেক বন্দোবস্ত করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ঘরে একজন পাচকের উপস্থিতির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, নিছক গরিবির কারণে পোস্টমাস্টার কোনো পাচক না-রেখে নিজে রেঁধে খেতে বাধ্য হয়েছেন। বাস্তবের যুক্তি হিসেবে এটাও খুব দুর্বল। যত 'সামান্য' বেতনই হোক, একজন পাচকের খরচা মেটানো ওই চাকুরের পক্ষে অসম্ভব হওয়ার কোনো কারণ নেই। স্পষ্টতই পোস্টমাস্টার ও রতনের নির্বিঘ্ন সম্পর্ক রচনা করতেই গল্পের এ আয়োজন।

সমস্ত সম্পর্কের প্রত্যক্ষতা থেকে মুক্ত করে তৈরি-করা এ এক নতুন সম্পর্কের ল্যাবরেটরি। পরিণতিতে পোস্টমাস্টারের দিক থেকে এক আকাঙ্ক্ষার ব্যাকরণ, আর রতনের দিক থেকে সম্পূর্ণ আরেক।

২.৩

পটভূমি পেরিয়ে, সম্পর্কের তিন ধাপ অতিক্রম করে, বিদায়বেলার সংলাপ ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে পোস্টমাস্টারের যে-সামগ্রিক পরিচয় দাঁড়িয়েছে, তাতে তাকে প্রধানত একজন যুক্তিবাদী ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবেই পাওয়া যায়। রতনের অনুভূতিকে দেখার-চোখ বানিয়ে পড়লে অবশ্য তাকে খানিকটা স্বার্থপরও মনে হতে পারে। কিন্তু দুজনের কোনো চূড়ান্ত-সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, আর রতনের মনোভাব শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকায়, এ অভিযোগ খুব তীব্র হওয়ার সুযোগ নেই। বলা যায়, রতনের মতো পাঠকের তরফেও বড়-জোর অনুযোগ বা অভিমান প্রকাশ করা চলে। কিন্তু তার যুক্তিপ্রবণ সহানুভূতিশীল মন নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ ঘটেনি। বিদায়কালে সে রতনের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম বন্দোবস্তই করেছে।

তারও আগে রতনের সাথে পাহাড়-প্রমাণ দূরত্ব ঘুচিয়ে সে মিশেছে অন্তরঙ্গ কায়দায়। পড়াশোনা শিখিয়েছে যত্ন করে। দুক্ষেত্রেই চাহিদাটা তার দিক থেকে থাকলেও রতনের আগ্রহের ও সন্তুষ্টির রীতিমতো বাড়াবাড়ি দেখা গেছে। কেবল তৃতীয় পর্বের বেলায়, অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে সেবা-গ্রহণের বেলায় হিসাবটা একটু অন্যরকম। এখানে পোস্টমাস্টার নিরুপায় গ্রহীতা। রতন দাতা। এর মধ্য দিয়ে পোস্টমাস্টারকে কি ঋণী বলে সাব্যস্ত করা যায়? রতন তার পরিচারিকা – এ তথ্য মনে রাখলে ওই সিদ্ধান্ত নেয়া আসলে কঠিন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অন্য দু-একটি রচনার সাহায্য নেয়া যাক। বিখ্যাত 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় জীবন-বাজি-রেখে সেবা করাকে ভৃত্যের জন্য বাড়তি কিছু ভাবা হয়নি। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি এদিক থেকে আরো এক ধাপ অগ্রবর্তী। সেখানে প্রভুর ঋণ ভৃত্য শোধ করেছে রীতিমতো রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়। পুরো প্রক্রিয়াকে রাইচরণ নিয়তি-নির্ধারিত বলেই

ব্যাখ্যা করেছে। এসব কথা মনে রাখলে রতনের কাছে পোস্টমাস্টারের ঋণের দাবিটা আর বড় হয়ে ওঠে না। যদি তাই হয়, তাহলে রতনকে আরো বেশি 'গুরুত্ব' না-দেয়াটা পোস্টমাস্টারকে উদারনীতিবাদী বলার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

পুরো গল্পে রতনের প্রধান যে-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাকে বলতে পারি দায়িত্বশীলতা ও অন্তরঙ্গ সক্রিয়তা। যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে আগে কখনো যায়নি, সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই সে ওগুলোকে নিজের জীবনের অঙ্গ করে নিতে পেরেছে। তবে পোস্টমাস্টারের বিদায়বেলায় তার নতুন যে-বিশিষ্টতা বড় হয়ে উঠেছে, তাকে বলতে পারি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। রতনের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এরকম ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন ঠিক 'বাস্তবসম্মত' কি না, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫ : ১৩৩) মনে করেন, রতন পোস্টমাস্টারের সাথে যাওয়ার আবদার করেছে প্রেমের অধিকারে; আর এ প্রেম পোস্টমাস্টারের সম্পর্ক-নিরপেক্ষভাবে একেবারেই তার নিজের গড়া। এখানকার 'প্রেম' শব্দটিকে মুলতবি রেখে বলা যায়, রতনের মধ্যে ঘটনা-পরম্পরায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটা খুবই সম্ভব। আর তাতে পোস্টমাস্টারের উদারনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া প্রভুর সান্নিধ্যে রতন যেসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গেছে, যেমন অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা বা পড়াশোনা করা, তার মধ্যেও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূল নানা উপাদান ছিল।

অবশ্য রতনের আবেগী বা অভিমানী ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথের মানুষ-তত্ত্বই যথেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের মানুষ-উপলব্ধির মধ্যে একটা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যা দুনিয়ার অন্য লিবারেল শিল্পীদের থেকে বেশ আলাদা। 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী বা 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা তাদের শ্রেণি-অবস্থান ও অন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল না-হয়েই ব্যক্তিত্বের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পেরেছে। রতনের ক্ষেত্রে সেরকম না-হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং রতনের একটা বাড়তি সুবিধা ছিল। সেবার মধ্য দিয়ে সে অধিকার অর্জন করেছে। বলা যায়, ওই অধিকারের বরাতেই সে তীব্র বাক্যে নিজের 'এজেন্সি' বা 'কর্তাসত্তা'র ঘোষণা দিয়েছে। ঘটনাটা যেভাবে ঘটুক না কেন, বলতেই হবে, এর স্বভাব 'বাস্তববাদী' নয়, এবং এ মূল্যায়ন আবার মনে করিয়ে দেয়, সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্র-গল্পের বাস্তবতার ধরন একেবারেই আলাদা, যে বাস্তবতার ওপর *গল্পগুচ্ছে*র মনোরম এবং কালোত্তীর্ণ সৌধ গড়ে উঠেছে।

অন্য অনেক কিছুর সাথে পোস্টমাস্টার ও রতনের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো টেক্সটের রূপক-সম্ভাবনার অনুকূল। তবে ঔপনিবেশিক সম্পর্কের কার্যকর রূপক হিসেবে গল্পটি পড়ার জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক সম্পর্কের কতগুলো বিশেষ বাস্তবতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া জরুরি।

৩

ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান স্তম্ভ। এ ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাইদের (১৯৯৪ : ১৬০) মন্তব্য : 'By the late nineteenth century India had become the greatest, most durable, and most profitable of all British, perhaps even European, colonial possessions.' বাংলা অঞ্চল, বিশেষত কলকাতা, এদিক থেকে আরো অনেক এগিয়ে। আর্থিক-রাজনৈতিক ব্যাপারে যাই হোক, সাংস্কৃতিক পশ্চিমায়ন ও উপনিবেশায়নের দিক থেকে কলকাতাই ছিল ভারতের তীর্থস্থান। আশিস নন্দীর (১৯৮৯ : ২৭) ভাষ্য: 'It was in Bengal that the western intrusion was the deepest and the colonial presence the longer.' কলকাতাকেন্দ্রিক কলোনিয়াল শাসনে শোষণ, নিপীড়ন, বর্ণবাদ ও আধিপত্যবাদী অপর-সব আচরণ পুরো মাত্রায় সক্রিয় ছিল (মোহাম্মদ আজম, ২০১৯ : ৪৫-১৩৬)। কিন্তু দুনিয়ার অন্য সকল উপনিবেশের মতো ভারতীয় কলোনিয়াল শাসনের খুবই আলাদা কিছু বিশিষ্টতাও ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটিকে এভাবে বর্ণনা করা যায়: এক. জনমিতির দিক থেকে হিন্দু-সংখ্যাধিক্য, অথচ আগের অন্তত সাতশ বছরের শাসনে মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য। খুব স্বাভাবিক কারণে সেই আঠার শতক থেকেই প্রাথমিক 'ইডিওলজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাসে'র অংশ হিসেবে ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের অপরায়ণ করেছিল, আর কলকাতায় হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির কাছে তা সর্ব-সম্মতি লাভ করেছিল (মোহাম্মদ আজম, ২০১৯ : ১৫৪-৬২)। দুই. একেবারেই শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদীরা কলকাতায় ভারতীয় অতীতের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়, আর শাসনকাজেও প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করে। স্বভাবতই এ দৃষ্টিভঙ্গি উপনিবেশিত-পক্ষের গভীর সমর্থন লাভ করে।

উপরে উল্লেখিত দুটি বিশিষ্টতার প্রথমটি বর্তমান আলোচনায় প্রত্যক্ষত প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে ওই উপাদান দ্বিতীয়টির সাথে মিলে উনিশ শতকের কলকাতায় কলোনিয়াল শাসনের প্রতি নজিরবিহীন সম্মতি তৈরি করেছিল। অবশ্য এ সর্ব-সম্মতির পেছনে কলোনিয়াল শাসনের প্রথম দিককার কিছু অনিবার্যতাও বড় ভূমিকা রেখেছে। নিচে বর্তমান আলোচনার সাথে সম্পর্কিত এরকম তিনটি দিকের উল্লেখ করা হলো।

এক. ইংল্যান্ডের তরুণদের জন্য ব্যবসা বা শাসনকাজে ভারতে আসা কোনো স্বস্তিকর বিষয় ছিল না। জীবিকার সন্ধানে বা সচ্ছলতার আশায় তারা এখানে আসতে বাধ্য হতো; কিন্তু এসেই অসংখ্য প্রতিকূলতা এবং ঘোরতর নিঃসঙ্গতায় ভুগত। দেশীয় ভাষা, আইনকানুন ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। স্থানীয় কোনো সহায়ক-শক্তি তখনো বিকশিত হয়নি। নিজেদের লোকবলও ছিল যৎসামান্য। ১৭৫৭ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় (Ghosh, 1998 : 1),

কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীর সংখ্যা তখন মাত্র ৭৬ জন, ফোর্ট উইলিয়ামে ইউরোপীয় অফিসার আর সৈন্য মিলে সাকুল্যে ২৬০ জন, সারা অঞ্চলে কোম্পানির ঘাঁটিগুলোতে ছড়ানো-ছিটানো আরো ২৪০ জন – এই ছিল মোট লোকবল। এর বাইরে কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন ইংরেজের সংখ্যা শ-খানেক। এ পরিসংখ্যানের সাথে ইংল্যান্ডের সাথে ভারতের দূরত্ব, যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ সময়, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং সংস্কৃতি ইত্যাদি যোগ করলে ওই তরুণদের ভয়াবহ নৈঃসঙ্গ্য ও হতাশার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

দুই. কলোনিয়াল শাসনের প্রথম যুগে ভারতের ইংরেজ তরুণদের বিষয়ে এরিক স্টোক (১৯৫৯ : ১-২) লিখেছেন :

> A handful of eighteenth-century Englishmen, scattered throughout the Bengal territories, without English wives, or prospects of furlough, and with no rigid moral or religious code, soon adapted themselves to Indian ways of living. Set on making their fortune before the climate or disease carried them off, they were zealots for no cause or political principle, and were content to conduct the public business according to its traditional Indian forms and in the traditional hybrid Persian.

নানা সংগত ও বোধগম্য কারণে উনিশ শতকের অন্তত প্রথম তিন দশক পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠীর সুর খানিকটা নরম ছিল। কারো কারো মধ্যে শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাবও দেখা গেছে। এ সময়ের কলোনিয়াল শাসন-দৃষ্টির মূলকথা এভাবে বলা যায়: ভারত শাসিত হবে ভারতীয় রীতিনীতিতে (Said, 1994 : 180), আর শাসকদের রপ্ত করতে হবে এশীয় আচরণ (Kopf, 1969 : 18)। পুরনো তরিকায় ভারত-শাসনের ব্যাপারে হেস্টিংসের পক্ষপাত খুবই প্রত্যক্ষ; আর কর্নওয়ালিশ অনেকগুলো নতুন উদ্যোগ নিলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া যায় 'defensive form' (Stokes, 1959 : 2-3)।

এ আবহেই কলকাতায় এবং ইউরোপে প্রাচ্যবাদী চর্চার তুমুল প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ইউরোপের সাথে ভারতীয় ভাষার শুধু নয়, জনগোষ্ঠীরও নানা ধরনের ঐক্য প্রস্তাবিত হয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতীয় বিদ্যাবত্তা ও সভ্যতার ক্লাসিক যুগ।

তিন. উপরে বর্ণিত দুই বাস্তবতার – উপনিবেশক তরুণদের বিষণ্ন নিঃসঙ্গতা এবং উপনিবেশিতের মহিমা-বর্ণন – প্রত্যক্ষ আঁচে গড়ে উঠেছিল কলকাতার উপনিবেশিত ভদ্রলোক-সমাজ। পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এবং বিশেষত উপনিবেশ-বিরোধী মনোভাবের কারণে ব্রিটিশ শাসক ও স্থানীয় শাসিতের মধ্যে যেরকম মেরু-দূর ফারাক কল্পনা করা হয়েছে, উনিশ শতকের পরিস্থিতি মোটেই সেরকম ছিল না।

মেলামেশার একটা পর্ব গেছে আঠার শতকের শেষাংশে। এ পর্বে শাসক-ইংরেজের সঙ্গেও বাঙালির মেশার সুযোগ ছিল। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশি লোকদের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা করতেন (বিনয়, ২০০৪ : ২৭১)। রাজনারায়ণ বসু (১৪০২ : ২৮৮) এ সময়ের বাস্তবতা মনে রেখে লিখেছিলেন, 'সে কালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন'। কিন্তু উনিশ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শাসকদের অত কাছে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। তখন মেশামিশিটা হতো অ-শাসক ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের (Spear, 2004 : 207)। পুরনো অভিজাতরা নয়, নতুন সম্ভ্রান্ত শ্রেণি – ব্রিটিশ-শাসনকে কেন্দ্র করে এ শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ-পক্ষে ছিলেন কোর্টের উকিল, বিচারক, মিশনারি কিংবা ডেভিড হেয়ারের মতো প্রশাসন-বহির্ভূত মধ্যবিত্ত। 'দুর্গোৎসবের মতো সভায় কলকাতার সাহেবরা দল বেঁধে ধনীগৃহে প্রমোদসভায় যোগ দিতেন' (বিনয়, ২০০৪ : ৩১১)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৮ : ৫৩) তাঁর পিতার এক ভোজসভার বর্ণনায় লিখেছেন, 'যখন এখানে জেনারেল লর্ড অকলন্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়'। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য, পত্র-পত্রিকা, পাঠ্য-পুস্তক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনেও এরকম অন্তরঙ্গ মিলমিশের বাস্তবতা বিদ্যমান ছিল।

তারও আগে, সরকারি বন্দোবস্তে ১৮৩৫-এর শিক্ষানীতি চালু হবার বহু আগে থেকেই, কলকাতায় ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি-শিক্ষা রপ্ত করার ব্যাপক তোড়জোড় দেখা গেছে। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় আর স্থানীয়দের মধ্যে বিলক্ষণ মতৈক্য ছিল। সামান্য ইংরেজি শিখলে বেনিয়ানি করা যায়, সাহেবদের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। 'তাই নতুন যুগে যে-বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা বাড়তে লাগল সমাজে, সে হল ইংরেজিবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা' (বিনয় ২০০০ : ২০)। এ বাস্তবতা ইংরেজি শেখার প্রতি কী গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায়। তিনি লিখেছেন (১৯৫৭ : ৪৬) : 'ইংরাজী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা চাই এই রব দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল'। আরো লিখেছেন, ডেভিড হেয়ার তাঁর স্কুলে ভর্তিপ্রার্থীদের অনুরোধে-উপরোধে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাটির 'বাহির হইলেই দলে দলে বালক 'me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই ধারে ছুটিত'। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুতে কলকাতায় যে মাতম উঠেছিল (শিবনাথ, ১৯৫৭ : ১৫১), তা শহরবাসীর ইংরেজি শিক্ষাজনিত কৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।

এ ধরনের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের আরো অনেকগুলো উপলক্ষ্য কলকাতার ভদ্রলোক-সমাজের জন্য মজুত ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল পশ্চিমা সংস্কৃতি, আদব ও সভ্যতার

পাঠ। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা জানত, ব্রিটিশরা সম্পদ-পাচার করছে, এবং কলোনিয়াল নীতির কারণে দেশীয় শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ ছিল না। সম্পদ-পাচার বিষয়ে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'The Hindu Patriot looked upon this annual payment as India's tribute to England for the blessings of civilized rule.' (Chandra, 1975 : 116) এ অবস্থান আসলে কলকাতার ভদ্রলোক-সমাজের সাধারণ সামষ্টিক মনস্তত্ত্বেরই প্রতিফলন।

১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্কের ক্ষমতা-গ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাচ্যবাদীদের প্রতাপ শেষ হয়ে ইঙ্গবাদীদের যুগ শুরু হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে শাসন-নীতির আরেক দফা বদল হয়েছিল। কিন্তু প্রথম যুগের নমনীয়তা আর কখনোই ফিরে আসেনি। শাসক-শাসিতের পুরনো সম্পর্কও আর 'অন্তরঙ্গ'-রূপে ছিল না। তবু, রেনেসাঁ, আধুনিকায়ন, সভ্যতার বিস্তার, সোনালি অতীতের বিপরীতে বর্তমানের দীন-হীন ভারত এবং পশ্চিমের স্পর্শে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ইত্যাদি নানান কাঠামোয় সম্পর্কের গল্পটি পুরো উনিশ শতক জুড়ে উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়েই চলছিল। সেখানে শাসক-পক্ষের সমালোচনা ছিল, অভিমানও ছিল, কিন্তু বিরুদ্ধতা ছিল না। কেন?

রণজিৎ গুহ (১৯৮৮) সহ অনেকেই মনে করেন, উপনিবেশিতের অভিজাত ও ক্ষমতাবান অংশটি ঔপনিবেশিক-শাসনের প্রত্যক্ষ ছায়ায় বিকশিত, আর সে কারণেই উপনিবেশকের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে তাদের কোনো অবস্থান ছিল না। ডেভিড কফ (১৯৬৯) অবশ্য কলকাতার রেনেসাঁ তথা আধুনিকায়নের বীজ দেখেছেন ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদীদের চর্চায়। যদি তাই হয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা রাখায় কলোনিয়াল শাসনের প্রতি সুবিধাভোগী-অংশের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকাই স্বাভাবিক। কফের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সুব্রত দাশগুপ্ত উনিশ শতকের স্থানীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকারীদের সামষ্টিক মনস্তত্ত্বকে একটু ভিন্ন কাঠামো ধরে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে (২০০৭ : ২০), আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে সংঘটিত প্রাচ্যবাদী চর্চার বনিয়াদেই বঙ্গীয় রেনেসাঁ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে বলা যায় 'Orientalist cognitive identity'। উইলিয়াম জোনস, হেনরি কোলব্রুক এবং তাঁদের অনুগামী প্রাচ্যবিদরাই ভারতের 'সোনালি অতীত' নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু, সুব্রত দাশগুপ্ত (২০০৭ : ২৩৮) লিখেছেন, মুদ্রার সেটা একদিক মাত্র :

> Counterposing the British Orientalists, there were the British Anglicists...[who] brought to the table a schema about both the Indian past and Indian present that represented – again in Freud's term – a 'negative' identity. Together, the Orientalist 'positive' and

> the Anglicist 'negative' cognitive identities constituted the seed of the new shared cognitive identity for the Indian intelligentsia.

উনিশ শতকের শেষাংশে নব-আবিষ্কৃত 'ভারত' এবং পুনর্মূল্যায়িত 'পশ্চিম' সমন্বিত হচ্ছিল বিচিত্র সৃষ্টিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়; আর এ সমন্বয়-সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪

১৯০৩ সালের পরে বাংলা অঞ্চলে আন্দোলন-সংগ্রামের যে-রূপ বিকশিত হয়েছিল, তার সাথে মিলিয়ে দেখলে উনিশ শতকের ভদ্রলোক-শ্রেণির এ ধরনের তৎপরতাকে খুবই মলিন আর নির্বিষ মনে হবে। এটা ঠিক, উনিশ শতকের শেষ দিকে অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন, করের বোঝা, সম্পদ-পাচার কিংবা কুটির শিল্পের বিলয়ের মতো প্রক্রিয়ায় ভারতের দারিদ্র্য বেড়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকদের যাবতীয় উদ্যোগই আপোশ-মীমাংসা এবং দরখাস্তে সীমিত ছিল। কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন রায়ের আমলে যেসব আবদার যে-পদ্ধতিতে উত্থাপিত হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষেও তার মধ্যে কোনো নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়নি (Sarkar, 2000 : 55-56)। শাসকপক্ষের সহায়তা ও মধ্যস্থতা ব্যতীত সামাজিক-সাংস্কৃতিক তো বটেই, এমনকি আধুনিকায়নের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হবে, এটাই ছিল গোটা উনিশ শতক জুড়ে কলকাতার ভদ্রলোকদের ব্যতিক্রমহীন চিন্তাধারা।

উনিশ শতকে কলোনিয়াল শাসনের প্রতি কলকাতার ভদ্রলোক-সমাজের এ সম্মতির নমুনা ওই শতকের গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ব্যক্তিত্বের চিন্তা-কর্ম-রচনায় পাওয়া যাবে। তবে বর্তমান প্রবন্ধের জন্য খোদ রবীন্দ্রনাথ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেয়াই উত্তম। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের সাথে ভাবগত মিল আছে, কিংবা খুব কাছাকাছি সময়ে রচিত গোটা দুয়েক রচনা থেকে উদাহরণগুলো চয়ন করা হলো।

ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের মোহ ছিল। মোহটা এসেছে পশ্চিমা সভ্যতার সংস্পর্শের সুযোগ আর এর ফলে কলকাতায় বিকশিত নতুন চিন্তা-ভাবনার বরাতে। আবার এ সম্পর্কে তাঁর এক ধরনের দ্বিধাও ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ নানা অভিজ্ঞতা – প্রধানত শাসকগোষ্ঠীর বর্ণবাদী আচরণ আর নিপীড়ন – সে দ্বিধার উৎস। ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ জন্মোৎসবে পঠিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসন বিষয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষার রূপ আর হতাশার চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোর কেটেছে এমন এক ভারতবর্ষে, যেখানে অন্তত শিক্ষিত ভদ্রসমাজ ইংরেজ-শাসনকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল মূলত শাসিতের প্রতি শাসকের সদয় আচরণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক

শাসন স্বভাবতই বর্ণবাদী আর নিপীড়ক। ১৮৯০ সালের ১৫ মে তারিখে পঠিত প্রবন্ধ 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রসঙ্গে পঞ্চাশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম – পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিখানেক লম্বা করে দেবার জন্য।' (উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার, ১৪২৫ : ৩৪) কিন্তু কলোনিয়াল শাসন এটুকু ছাড় দিতেও প্রস্তুত ছিল না। এ অবস্থায় উপনিবেশিতের উচ্চারণ প্রায়ই অভিমানের রূপ নিয়েছে। *রাজা প্রজা* গ্রন্থের 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৩০০) প্রবন্ধে সে অভিমানের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে :

> ওইটেই ইংরাজের দোষ – সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। ... মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা। ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেইটি নাই। *সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে।* ... ইহারা দয়া করে না, উপকার করে; স্নেহ করে না, রক্ষা করে; শ্রদ্ধা করে না, অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮ : ৩৮১; বাঁকা হরফ সংযোজিত)

অভিমানের এ ভাষা এবং তার প্রকাশ স্পষ্টতই রতনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ দীর্ঘ প্রবন্ধের পরের একাংশে ইংল্যান্ড ও ভারতের সম্পর্ককে তিনি স্বামী ও স্ত্রীর রূপকে প্রকাশ করেছেন। সেখানে অভিমান কোথাও কোথাও বিদ্রূপের আকার নিয়েছে:

> হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না, তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। *এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়।* তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো; খসখসের পর্দা টাঙাইয়া জল সেচন করো, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। ... *আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝংকার-সহকারে দু-কথা পাঁচ-কথা শুনাইয়া দিতেছ।* কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে, আরামে থাকে, একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮ : ৩৯১; বাঁকা হরফ সংযোজিত)

রবীন্দ্রনাথ এখানে-যে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে কথাগুলো বলেছেন, তার তো উল্লেখই আছে; কিন্তু রতনের সেবা ও শেষের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিমানের সাথে এর মিল কি নিছক কাকতালীয়?

রাজা প্রজা গ্রন্থের 'রাজভক্তি' প্রবন্ধটি ১৩১২ সালের মাঘ সংখ্যা *ভাণ্ডারে* প্রকাশিত হয়। অনেক পরের এ প্রবন্ধে কলোনিয়াল শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-আলংকারিতকতার আশ্রয় নিয়েছেন, যেভাবে সম্পর্কের বর্তমান রূপ ও

তার সংকট চিহ্নিত করেছেন, 'পোস্টমাস্টার' গল্পের সাথে তার গভীর এবং ক্ষেত্র-বিশেষে প্রায় আক্ষরিক মিল নজর এড়ায় না :

> ইংরাজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনাগোনার রাজত্ব না হইত, যদি এ দেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় *ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য এ দেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে 'আমরা কর্তা' – এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।* আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, এ কথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন-কি, *তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব তাহাও তাহারা স্পর্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।* (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮ : ৪৩৬; বাঁকা হরফ সংযোজিত)

এ ধরনের ক্ষণস্থায়িত্বের সংকট দেখি পোস্টমাস্টারের মধ্যে, আর রতনের সাথে তার সম্পর্কের সংকট বেশ কতকটা তারই ফল। রাজ-কার্য না হোক, অফিস-কার্যের যে-অংশটি রতনের সাথে সম্পর্কিত, পোস্টমাস্টার তার কোনো খবরও রতনকে দিতে আগ্রহ দেখায়নি। এর মধ্য দিয়ে সেবা ও কৃতজ্ঞতার যৌথতায় গড়া রতনের কর্তাসত্তা কোন রূপে কতটা আহত হয়ে থাকতে পারে, তারই অন্যতর গদ্যভাষ্য যেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বেশ কয়েক বছর পরে লেখা ওই 'রাজভক্তি' প্রবন্ধের নিচের অংশে :

> বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে – রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। *ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, এ কথা মনেও করিয়ো না। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক, ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কী চায়।* ইহা জানিয়ো হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮: ৪৪০-৪১; বাঁকা হরফ সংযোজিত)

এ প্রমাণ অবশ্য ব্রিটিশ-ভারতের শাসকগোষ্ঠী – অন্তত রবীন্দ্রানথের ভাষ্য-মোতাবেক – পায়নি; পায়নি 'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রভুটিও। রতনকে যথেষ্ট টাকা দিয়ে, এবং ভবিষ্যৎ স্বস্তির বন্দোবস্ত করে সে ভেবেছে, যথেষ্ট করা হলো। কিন্তু 'রাজভক্তি' প্রবন্ধের সাক্ষ্য-মোতাবেক বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ একে যথেষ্ট মনে করতেন না।

৫

উনিশ শতকের কলকাতায় বিকশিত কলোনিয়াল সম্পর্ক অর্থাৎ উপনিবেশক-উপনিবেশিতের সম্পর্কের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ-বিষয়ক প্রাবন্ধিক

গদ্যের সাথে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের ঐক্য উপরে দেখানো হলো। কিন্তু এ ঐক্য গল্পটির রূপক-স্বভাব নিশ্চিত করে না। রূপক-পাঠের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য গল্পের কৌশলগত দিকগুলো যেমন খতিয়ে দেখতে হবে, তেমনি গল্পের নির্মিত-জগতে সংঘটিত ঘটনা ও বিভিন্ন অণু-অংশের সাথে সম্ভাব্য রূপক-পাঠের পারস্পরিকতাও দেখাতে হবে।

গড়নের দিক থেকে 'পোস্টামাস্টার' গল্পের সবচেয়ে নজর-কাড়া বৈশিষ্ট্য এর কাঠামোগত ছক বা ছাঁচ। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ গল্পে বাস্তবকে অনুসরণ করতেন না, বরং গল্পের অনুকূলে বাস্তব তৈরি করে নিতেন। কাজেই তাঁর গল্পের অন্তর্লীন স্তরে এরকম কাঠামো বা ছাঁচ অন্য বেশিরভাগ গল্পকারের তুলনায় বেশি থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু 'পোস্টমাস্টার' গল্পে এ ছাঁচ যত স্পষ্ট ও কার্যকর, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গল্পে অতটা নয়। শুরুতেই চার-অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট পটভূমি নির্মাণ করে, তিন পর্বের সম্পর্ক রচনা করে কাহিনিটি বিচ্ছেদ ও সমাপ্তির আয়োজন করেছে। একটি অংশ আরেকটির ভিতর ঢুকে পড়েনি, কিংবা আবেগ-অনুভূতির প্রকাশে কোনো ক্রম লঙ্ঘন করেনি। বলা যায়, অন্তরালের একটি কথার অনুবাদ কাহিনি-স্তরে সম্পন্ন করেই লেখক পরের কথাটিতে গেছেন। শিল্পকলায় রূপক-নির্মাণের এটাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

আগে দেখানো হয়েছে, পোস্টমাস্টার ও রতনের আলাদা ও যৌথ একাকিত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে গল্পকার বিদ্যমান 'বাস্তব'কে পরিকল্পিতভাবে এড়িয়ে তৈরি করেছেন গল্পের 'বাস্তব', যা রূপক-পাঠের দিকেই প্ররোচিত করে। এখন বলা যাক, পোস্টমাস্টার ও রতনের পারস্পরিক দূরত্ব রচনায়ও লেখক প্রায় সমধর্মী আয়োজন করেছেন। গল্পটি-যে হিন্দু-সমাজের পটভূমিতে লেখা, তা বোঝা যায় সম্বোধন থেকে। কিন্তু কোনো প্রকার ধর্মীয় আচার দূরের কথা, বিশেষভাবে হিন্দু-সমাজের বলা যায়, এমন সামাজিক ভাষাও গল্পে ব্যবহৃত হয়নি। বর্ণ-পরিচয় ছাড়া হিন্দু-সমাজের গল্প অসম্ভব। অথচ এ গল্পে যুবা-পুরুষটির নামই নেই। ব্যবহৃত হয়েছে স্রেফ পেশাবাচক শব্দ। অন্য পক্ষের জন্য ধার্য হয়েছে এমন এক নাম, বাংলা ভাষার সংস্কৃতিতে যে-নামটি ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে ব্যবহারের চল আছে। এভাবে পরিচয়ের একাংশ লুকিয়ে ফেলা প্রমাণ করে, গল্পটির কোনো 'বাস্তববাদী' উচ্চাভিলাষ নেই।

তবে, ধর্ম-বর্ণের পরিচয়টা রেখে-ঢেকে প্রকাশ করলেও গল্পটিতে শ্রেণির বহুমাত্রিক পরিচয় আছে। তার সবগুলোতেই পোস্টমাস্টারের তুলনায় রতনের অতি-মাত্রায় অধস্তনতার প্রকাশ ঘটেছে। রতনের সম্বোধনে পোস্টমাস্টার 'বাবু' থেকে 'দাদাবাবু'তে উন্নীত হলেও ওই সম্বোধন কোনো চূড়ান্ত নৈকট্যের চিহ্ন হিসেবে যেন প্রতিষ্ঠিত না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই হয়ত, লেখকের তরফে 'প্রভু' শব্দটির আগমন ঘটে। গল্পে দুজনের অবস্থানগত ফারাকের আরেকটি গভীর চিহ্ন আছে। রতন প্রভুর

পাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। তার অন্যসব তৎপরতা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কম বয়স বা আনাড়িপনা এর কারণ নয়। প্রধান খাবার রান্না-করা ছাড়া রতন সব ধরনের রান্নাবান্না ও কাজই করে। তাছাড়া ব্যাপারটা যদি স্রেফ কুশলতার অভাব হতো, তাহলে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়া যেত। স্পষ্টতই, হিন্দু-সমাজে রান্নাবান্নার সাথে জাত-পাতের যে-সম্পর্ক সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাকে ব্যবহার করে গল্পকার দুজনের অবস্থানগত ব্যবধানকে জোরালো করতে চেয়েছেন।

রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের দূরত্ব প্রকটিত করার আরো বহু আয়োজন আছে এ ছোট্ট গল্পটিতে। চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে সেগুলো আরো বেশি স্পষ্ট হতে শুরু করে। তবে তারও আগে অন্তরঙ্গ বাতচিত শুরু হওয়ার মুহূর্তে পাঠক এক তীব্র আয়োজনের মুখোমুখি হয়। পোস্টমাস্টার এ ধরনের কথোপকথনে অগ্রসর হতে এক অর্থে বাধ্য হয়েছিল নিজের নৈঃসঙ্গ্য ও প্রকৃতির প্ররোচনায়। কিন্তু এরকম বাহ্য ও অন্তর্গত প্ররোচনা সত্ত্বেও কাজটা তার জন্য মোটেই সহজ ছিল না। খুব বড় বাধা ডিঙিয়ে তাকে কাজটা করতে হয়েছিল আচমকা। 'পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন' – কথাটা প্রমাণ করে, খুব ভেবে-চিন্তে কাজটা করার বাস্তবতা ছিল না। শুরুটা হঠাৎ হয়ে গেছে।

এভাবে দুজনের সম্পর্কের দূরত্ব নির্দেশের জন্য পুরো গল্পের যে-অজস্র আয়োজন, তাকে শ্রেণি-ব্যবধান হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। হিন্দু-সমাজের বর্ণ-বিভাজন দিয়েও এর বিশ্লেষণ হয় না; কারণ, অন্য নানা আয়োজন বর্ণগত বিভাজনের দিক থেকে বাস্তব নয়। অথচ কলোনিয়াল অর্থাৎ উপনিবেশক-উপনিবেশিতের সম্পর্কের নিরিখে এ দুজনকে পাঠ করা চলে। বিশেষত কলকাতায় বিকশিত প্রাচ্যবাদী ঘরানার সম্পর্কের কথা বিবেচনায় রাখলে একই সাথে অপরিসীম দূরত্ব ও নানাপ্রকার পারস্পরিকতার হিসাব মেলে।

রতনের চরিত্র-কল্পনার কয়েকটি দিকও প্রবলভাবে কলকাতার উপনিবেশিত বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়। তার বর্তমান অবস্থা ভীষণ রকমের শোচনীয়। মা-বাবা নেই, কোনো সহায়-সম্বল নেই। কিন্তু বারো-তেরো বছরের মেয়েটির জন্য বরাদ্দ-করা 'বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না' বাক্যটিই সবচেয়ে নির্মম। নিজস্ব বর্তমানময়তায় তার মুক্তির কোনোরকম সম্ভাবনা নেই – এ বোধ তৈরি করা ছাড়া বাক্যটির আসলে আর কোনো অর্থ হয় না। কারণ, অন্য কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতেও এর পক্ষে কিছুই বলা হয়নি। বরং রতনের অপরাপর গুণ ও তৎপরতা আমলে আনলে বিপরীত সিদ্ধান্তই নিতে হয়। স্পষ্টতই রতনের জরাজীর্ণ ও সম্ভাবনাহীন বর্তমান নির্মাণই এ বাক্যের একমাত্র লক্ষ্য।

বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত হলেও রতনের অতীত কিন্তু বেশ আকর্ষণীয়। সেখানে বাবা-মায়ের বাইরে তার স্নেহ-করার-মতো ছোট ভাইও ছিল। এরা সবাই রতনের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু যে-দিকটা গল্পের গতি ও মতিতে স্পষ্ট তা হলো, এ বিষয়ে লেখক কিছু বলতে চাননি। তিনি মাঝের অন্ধকারসহ অতীতের আলো তৈরি করেছেন। রতনের বাপ-ভাইয়ের ছোট বিবরণটিতে অতীত ক্রিয়াপদের টানা ও বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। তাতে মাঝের ছেদটি বড় হয়ে ওঠে। এটাও হয়ত কাকতালীয় নয়, রতনের ক্ষেত্রে যেখানে বাবার উল্লেখটা প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে পোস্টমাস্টারের বর্ণনায় তার বাবার প্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত। রতনের সহায়হীন হয়ে ওঠার বিপরীতে পোস্টমাস্টারের স্বনির্ভর আত্মতার একটা ইশারা হয়ত এখান থেকে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, বর্তমান ও নিকট-অতীতের দুর্গতি রতনের একই রকম ভবিষ্যতের কথা বলে না। এখন কাকতালীয়ভাবে তার সাথে পোস্টমাস্টারের সাক্ষাৎ হয়েছে। সে পেয়েছে শিক্ষার সুযোগ। সেবার মধ্য দিয়ে কর্তাসত্তা ঘোষণার অধিকার। তার ব্যক্তিত্বের অন্যরকম বিকাশ ঘটেছে। কাজেই পোস্টমাস্টারের সান্নিধ্যে রতনের পরিবর্তন রীতিমতো বৈপ্লবিক। পাঠকের হয়ত আরো চোখে পড়বে, পোস্টমাস্টারের নিজের পরিবারের গল্প শুনে শুনে রতন কেবল তাতে অভ্যস্তই হয়নি, তার কল্পনার জগতেও সে গল্পের চরিত্ররা ভিড় করেছে। রতনের চরিত্রায়ণের এ ছক ও উপাদানগুলো প্রায় আক্ষরিকভাবে উনিশ শতকের কলোনিয়াল কলকাতায় বিকশিত ইতিহাস-দৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। ইউরোপীয়রা নিজেদের ইতিহাসের যে-কালবিভাজন ভারতের ইতিহাসে আরোপ করেছিল, তার অনুকরণে ভারতীয় কল্পনায় ইতিহাসের মূল কালক্রমটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এরকম যে – অতীতকাল হিন্দু গৌরবের যুগ, মধ্যযুগ মুসলমান দুঃশাসন ও তার পতনের কাল, আর আধুনিক যুগ নবজাগরণের। বিপর্যস্ত বর্তমানের মধ্যে নবজাগরণ সম্ভব; কারণ, পশ্চিমা শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সোহবতে ভারত তার বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে।

চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে পোস্টমাস্টারের দিক থেকে সমস্ত অন্তরঙ্গতার ইতি ঘটে, কিন্তু মানবিক বোধসমূহের পূর্ণ প্রকাশে কোনো খামতি দেখা যায় না। সহানুভূতি ও যত্নশীল উদার-হৃদয় তরুণ হিসেবেই পাঠক পোস্টমাস্টারকে আবিষ্কার করে। তবে রতনের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার সাথে তার দূরত্ব আরেকবার ঘোষিত হয়। তাতে রতনের আবেগের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় পোস্টমাস্টারের বাস্তবনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদিতা। কলোনিয়াল সম্পর্কের সবচেয়ে মধুর সময়েও কলকাতায় তো বটেই, সারা দুনিয়াতেই এ বৈপরীত্যের বোধ প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ছিল।

৬

যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার বরাত দিতেই হয়, তাহলে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের আবহে জনৈক অনামা পোস্টমাস্টারের তুলনায় ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতাই বরং অনেক বেশি জুতসই হবে। 'ঠাকুর-পরিবারের লেখাপড়ায় অমনোযোগী কনিষ্ঠ ছেলেটিকে হয়ত বাধ্য হয়েই' জমিদারি চালনার ভার নিয়ে ঘোর গ্রামে আসতে হয়েছিল (আনোয়ার, ২০১৫ : ১৫৭)। গল্পের পোস্টমাস্টার যেমন এসেছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪২৫) নতুন জায়গা ও প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও শিলাইদহে থাকার ক্ষেত্রে, বিশেষত সপরিবার থাকার ক্ষেত্রে, নানারকম সমস্যার কথা বলেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ-যে সুযোগ পেলেই চলে যেতেন কলকাতা বা অন্যত্র, তারও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এসব মিল থেকে 'পোস্টমাস্টার' গল্পে লেখকের আত্ম-প্রতিবিম্ব খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ওই যুবা-পুরুষটির চরিত্রায়ণে সেরকম ইশারা অন্তত প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। চরিত্রটির নির্বিকার-নিরাসক্তির মধ্যে একটা উদারনৈতিক মানবিকবোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট। 'অস্বাভাবিক' দূরত্বে থেকে কারো প্রতি এ ধরনের মানবিকতা দেখানো সাধারণভাবে দুরূহ। কিন্তু এ গল্পে তা সম্ভব হয়েছে। কাজটি লেখক করেছেন মুখ্যত প্রকৃতির বিচিত্র-কুশলী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। 'ব্যবহার' কথাটাও বোধহয় এক্ষেত্রে সুপ্রয়োগ নয়। প্রকৃতি এখানে কেবল উপাদান বা উপকরণ হিসেবে থাকেনি, দ্বিতীয় স্তরে হয়ে উঠেছে সক্রিয় চরিত্র, আর তৃতীয় বা আরো গভীর স্তরে জীবনদৃষ্টির আকর সত্য।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৪০৮) ও অন্য বহু বিশ্লেষক মনে করেন, পূর্ব বাংলার নদী-প্রকৃতি-বেষ্টিত বিশেষ বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশীল রচনার অতি গুরুত্বপূর্ণ – সম্ভবত শ্রেষ্ঠ – অংশের উৎস। *গল্পগুচ্ছে* এই মানবজীবন বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত (বুদ্ধদেব, ১৯৮৩ : ৩৬)। 'পোস্টমাস্টার' গল্প এ মতের অন্যতম প্রধান সাক্ষ্যই শুধু নয়, উপাদান-স্তরে প্রকৃতি এ গল্পে এমন কিছু কৌশলগত দায়িত্ব পালন করেছে, যা *গল্পগুচ্ছের* প্রকৃতিপ্রবণ গল্পগুলোর তুলনায়ও বেশি। গল্পটির কাঠামোগত যে-ছাঁচের কথা আগে বলা হয়েছে, তার অংশগুলো পরীক্ষা করলেই এ কথার প্রমাণ মিলবে। প্রতিটি অংশই শুরু হয়েছে প্রকৃতির বর্ণনায়। প্রথমে সন্ধ্যার গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশ, পরের ধাপে বর্ষার দ্বিপ্রহরের পরিস্থিতি, এবং তৃতীয় ধাপে শ্রাবণমাসের বর্ষণমুখর দিন। প্রকৃতি এভাবে গল্পের ছাঁচ বা ছককে ঢেকে ফেলে বিবরণীর মসৃণতা তৈরিতে সাহায্য করেছে; এক পর্ব থেকে আরেক পর্বে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু শুধু উপকরণগত ব্যবহার দিয়ে এর তাৎপর্য বোঝা যাবে না। *ছিন্নপত্রাবলীর* ১৪৯ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬০ : ৩২৩) লিখেছিলেন, 'মনে আছে, ঠিক এই সময়ে

এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট্‌মাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারদিকের আলো এবং বাতাস এবং তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল।' এ ধরনের আবহই হয়ত প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে এমন সক্রিয় ও প্রভাবশালী করে তুলেছে যে, গল্পের ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং মনোভাবের নিয়ামক এক চরিত্র হিসেবেই তা আবির্ভূত হয়েছে। এ স্তরে প্রকৃতি নিখিল মানব-প্রকৃতির রূপ ধরে পোস্টমাস্টারের বাসনার নিয়ন্ত্রক হয়েছে; আর এ সূত্রেই জল-অচল ফারাক অতিক্রম করে পোস্টমাস্টারের পক্ষে রতনের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

পোস্টমাস্টারের মনের মতি ও গতির প্রায় একক নিয়ন্তা হিসেবে প্রকৃতিকে বলা যায় এ গল্পের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র। প্রকৃতির সক্রিয়তায় গল্পটি এগিয়েছে, এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে গিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে। পরিণতির স্তরে প্রায় একই মুহূর্তে দুটি বিপরীতধর্মী অনুভব পোস্টমাস্টারের জীবনদৃষ্টির এক গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করে। একদিকে 'একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল'; অন্যদিকে, 'নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনের এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' উপলব্ধির ওই গভীরতা তার নির্লিপ্ত লিপ্ততা এবং আবেগহীন সহানুভূতিকে বৈধতা দেয়। জরুরি তথ্য হলো, দুটি উপলব্ধিই একেবারে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির জিম্মায় রূপলাভ করেছে।

কাজেই 'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রকৃতি শুধু 'প্রকৃতিপ্রেম' ধরনের ব্যাপার নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু। এ পটভূমিতে পোস্টমাস্টারের সাথে রতনের তুলনা করলেই কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বস্তুত গল্পের কোথাও রতন-প্রসঙ্গে প্রভাবক বা নিয়ামক উপাদান হিসেবে প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়নি। রতনের মনের পরিচয় প্রকাশের জন্য লেখক রচনা করেছেন বহু-উদ্ধৃত 'মাটির সরার উপর টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল'-র মতো অসামান্য অলংকার। কিন্তু সেটা লেখকের বর্ণনার মুনশিয়ানা, রতনের সক্রিয়তায় নিষ্পন্ন বা রতনকে সক্রিয় করতে কার্যকর কোনো উপাদান নয়। এ দিক থেকে 'পোস্টমাস্টারে'র রতন 'অতিথি' গল্পের তারাপদ, 'ছুটি' গল্পের ফটিক, 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীসহ গল্পগুচ্ছের সমধর্মী প্রায় যে কোনো চরিত্র থেকে আলাদা। অন্যগুলোর মতো রতনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, রতন এখানে নিজেই প্রকৃতি। নারী কথাটি যে-অর্থে প্রকৃতির সমধর্মী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃতির বিপরীতে যে-অর্থে প্রকৃতি কথাটি ব্যবহৃত হয় – সেসব অর্থেই রতনকে 'পুরুষ'-এর বিপরীতে 'প্রকৃতি' হিসেবে পাঠ করা চলে।

কলোনিয়াল ডিসকোর্সে নারী, প্রকৃতি ও ভূমি সমান্তরাল বা প্রায়-সমান্তরাল অস্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপিত হওয়া বহু পুরনো সাহিত্যিক রীতি। রেনেসাঁর কাল থেকেই ইউরোপীয় শিল্পকর্মে নারী-শরীর এমনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, যেভাবে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারকারীরা নতুন ভূমি আবিষ্কার করে। ভূমি ও নারীর পৌনঃপুনিক তুলনা কলোনিয়াল বাস্তবতার এক গভীর মনস্তত্ত্ব হাজির করে, যেখানে নারী ভূমির মতোই পুরুষের দখলদারির জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করে (Loomba, 2001 : 73)। ঔপনিবেশিক শক্তি তথা ইউরোপীয় চিত্রায়ণে নারী দখলকৃত ভূমির প্রতীক। তবে উপনিবেশের স্থান-কাল ও বাস্তবতার দিক থেকে এ চিত্রায়ণে ফারাকও ছিল। আমেরিকা বা আফ্রিকার তুলনায় এশীয় নারীর চিত্রায়ণে কিছুটা ভিন্নতা এসেছে প্রধানত এখানকার সভ্যতা ও রাষ্ট্রক্ষমতার যে-রূপের সাথে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তার নিরিখে (Loomba, 2001 : 152)।

প্রকৃতি ও ভূমিকে নারীর সমরূপে উপলব্ধি করার এ ইউরোপীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ-যে পুরাদস্তুর অভ্যস্ত ছিলেন, 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' এবং 'রাজভক্তি' প্রবন্ধ থেকে দেওয়া পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলোই তার প্রমাণ। 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে তিনি যখন লিখেছেন, 'এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি *পুরুষরূপে* নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর-কিছুই হইতে পারে না' (বাঁকা হরফ সংযোজিত), তখন 'প্রকৃতি'র বিপরীতে ভারতীয় প্রাচীন দর্শনে বিবৃত 'পুরুষে'র কথাই তিনি বলেছেন। তবে এই 'পুরুষ'কে পুরুষতন্ত্রের কর্তা হিসেবে পড়তেও কোনো বাধা নেই। কলোনিয়াল ডিসকোর্সে কলোনিয়াল শাসনকে পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক শাসন হিসেবেই দেখা হয়। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পুরুষটি সম্পর্কে আরেকটি কথা অবশ্য যোগ করতেই হবে: এ যুবক প্রকৃতির বরাতে উদার মানবতাবাদী, আর কর্ম-প্রক্রিয়ায় উপনিবেশক পক্ষের 'সভ্যকরণ প্রকল্পে'র একজন সক্রিয় প্রতিনিধি। প্রকৃতি-প্রায় রতন প্রভুর কাছে সভ্যতার পাঠ নিয়েছে, সংস্কৃতির সবক নিয়েছে। তাতে মানুষ হিসেবে তার বদলও হয়েছে।

রতনের অভিমান তাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সোহবত থেকে বঞ্চিত হবার অভিমান। নিছক প্রেম বা সার্বিক অনুভূতির বরাতে এর তত্ত্বতালাশ সম্পন্ন হবে না।

৭

বিশ শতকের গোড়ায় স্বদেশি আন্দোলন ও পরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাঠামোগত প্রভাবে ব্রিটিশ-শাসন ও ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয় ভদ্রলোক-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় বদল আসে। উনিশ শতকের শেষাংশে এর অল্প কিছু ইশারা-ইঙ্গিত

পাওয়া গেলেও তা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করেনি। উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর এ সময়ের রচনায় শাসক-পক্ষের প্রতি অভিমান এবং ভারতীয়দের যথেষ্ট সম্মান না-দেখানোর অভিযোগটাই প্রবল। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় এ অবস্থার ব্যাপক বদল হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে পাল্লা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে নিজেকে অনেক মূর্তভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন। বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়নে তাঁর অমোঘ কীর্তি (মোহাম্মদ আজম, ২০১৯) অনুসরণ করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

অবশ্য দুনিয়ার সবচেয়ে সৃষ্টিশীল লিবারেলদের একজন হিসেবে তাঁর পক্ষে কোনো চরমপন্থি অবস্থান গ্রহণ সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব তার সাংস্কৃতিক বিনিময় ও মিশ্রণের অসামান্য প্রবণতা ও সাফল্যে। সুব্রত দাশগুপ্ত (২০০৭) যাকে বলেছেন 'shared cognitive identity', ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সম্ভবত তার সর্বোত্তম নিদর্শন। তিনি শুধু সবচেয়ে সাফল্যের সাথে প্রাচীন ভারতের পটভূমিতে নতুন ভারতের ভাবমূর্তিই প্রণয়ন করেননি, পশ্চিমের সাথে মিলনের সর্বোত্তম ভাষাও প্রস্তাব করেছেন। ফলে কোনো চূড়ান্ত অর্থে বৈপ্লবিক অবস্থান গ্রহণ তাঁর পক্ষে ভাবগত কারণেই সম্ভব ছিল না।

উনিশ শতকের শেষ দশকটিতে তিনি বাংলার গ্রাম ও প্রকৃতি আবিষ্কার করেছেন, রোমান্টিকতা ও লিবারেল দর্শনের সমন্বিত পাটাতনে অবস্থান করছিলেন, আর বাস্তব ও বাস্তবতার নতুন নির্মাণে রচনা করে চলছিলেন এক অভূতপূর্ব শিল্পসম্ভার। এ সবের সমন্বয়ে গল্প লেখার এক উত্তুঙ্গ পর্বে তিনি রচনা করলেন 'পোস্টমাস্টার', যা সম্ভবত শুধু ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের নয়, উনিশ শতকীয় কলকাতার ভদ্রলোক-সমাজের সামষ্টিক অচেতনের এক বিশেষ প্রবণতার ক্লাসিক প্রকাশ হয়ে রইল।

গ্রন্থপঞ্জি

আনোয়ার পাশা, ২০১৫। *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা* (৩য় মুদ্রণ)। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৭২। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস*। এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং, কলকাতা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ১৯৯৭। *রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প*। সাহিত্যলোক, কলকাতা

তপোব্রত ঘোষ, ২০১২। *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ* (পুনর্মুদ্রণ)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৮। *আত্মজীবনী*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

দেবেশ রায়, ২০০৮। *বিপরীতের বাস্তব: রবীন্দ্রনাথের গল্প*। পত্রলেখা, কলকাতা

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ১৪০৮। *বাঙালী জীবনে রমণী* (চতুর্দশ মুদ্রণ)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায়, ১৪১০। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা* (ষষ্ঠ সংস্করণ)। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪২৫। *রবীন্দ্রজীবনকথা* (চতুর্দশ মুদ্রণ)। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

প্রশান্ত মৃধা, ২০১৭। 'রতনের বিপরীতে একটি কথা'। *রাইজিংবিডি.কম*, প্রকাশিত: ৬ আগস্ট ২০১৭, আপডেট: ৮ মে ২০২১, https://www.risingbd.com/rabindra-nath/news/235565#.YRk6HvOIqjY.link

বিনয় ঘোষ, ২০০০। *বাংলার বিদ্বৎসমাজ* (৪র্থ সংস্করণ)। প্রকাশ ভবন, কলকাতা

বিনয় ঘোষ, ২০০৪। *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* (অখণ্ড, ৫ম সংস্করণ)। বাক্‌সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮৩। *রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য* (৪র্থ মুদ্রণ)। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা

মাসুদুজ্জামান, ২০১৩। 'উপনিবেশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'। *তোমার সৃষ্টির পথ* [সম্পা. বিশ্বজিৎ ঘোষ], নান্দনিক, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম, ২০১৮। 'গল্পের বাস্তব ও বাস্তবের গল্প: 'সমাপ্তি' ও 'পুঁইমাচা'', *পরাণ কথা* [সম্পা. তাশরিক-ই-হাবিব], ঢাকা

মোহাম্মদ আজম, ২০১৯। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* (২য় মুদ্রণ)। আদর্শ, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৯। *ছিন্নপত্র*। বিশ্বভারতী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৪৮। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দশম খণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৬০। *ছিন্নপত্রাবলী*। বিশ্বভারতী, কলকাতা

রাজনারায়ণ বসু, ১৪০২। *সে কাল আর এ কাল। নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ* (সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ), কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (২য় সংস্করণ)। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সৈয়দ শামসুল হক, ২০০৫। *মার্জিনে মন্তব্য*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

Chandra, Sudhir, 1975. *Dependence and Disillusionment: Emergence of national consciousness in the later 19th century India*. Manas Publications, New Delhi

Dasgupta, Subrata, 2007. *The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore*. Permanent Black, Delhi

Ghosh, Suresh Chandra, 1998. *The British in Bengal/ A Study of the British Society and Life in the Late Eighteenth Century*. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., New Delhi

Guha, Ranajit, 1988. *An Indian Historiography of India: A nineteenth-Century Agenda and its Implication*. K P Bagchi & Company, Calcutta, New Delhi

Jakobson, Roman, 1987. 'Two aspects of language and two types of aphasic disturbances'. *Languge in Literature* [ed. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy], The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, London

Kopf, David, 1969. *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1733-1835*. University of California Press, Berkley and Los Angeles

Loomba, Ania, 2001. *Colonialism/ Postcolonialism* (reprinted). Routledge, London and New York

Nandy, Ashis, 1989. *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism* (2nd impression). Oxford University Press, Delhi

Sarkar, Sumit, 2000. *A Critique of Colonial India* (2nd edition). Papyrus, Calcutta

Said, Edward W., 1994. *Culture and Imperialism*. Vintage, London

Spear, Percival, 2004. *The Oxford History of Modern India 1740-1975* (2nd edition, 21st impression). Oxford University Press, New Delhi

Stokes, Eric, 1959. *The English Utititarians and India*. Oxford, Great Britain